WBMDFC

KNOWLEDGE SERIES VIII

বেগম রোকেয়া

একটি জীবন, একটি ইতিহাস

মুখবন্ধ

সমাজ ইতিহাসের ধারায় দেখা গেছে কিছু কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়-এর দ্বারা অনন্য হয়ে ওঠেন। সততা, মুক্ত চিন্তা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাদের ব্যক্তিত্ব নিজ প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ।

'পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম' বিগত দিনের বাংলার কয়েকজন মনীষীর জীবন ও কর্মসাধনার বিবরণ একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র ও পুস্তিকার (WBMDFC-Knowledge Series) মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। এদের কর্মসাধনা ও জীবনব্রত পাঠে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই অনুপ্রাণিত হবে বলে আমাদের ধারণা। এই মহৎপ্রাণ মানুষদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে।

ডঃ পি. বি. সালিম, আই.এ.এস
চেয়ারম্যান
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

ভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা গেছে কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং ত্যাগ দ্বারা হয়ে ওঠেন কালজয়ী। মুক্ত চিন্তা ত্যাগ ও মানবজাতির সেবার মাধ্যমে তাদের কাজ চিন্তাভাবনা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম এরূপ মনীষীগণের জীবন ও কর্মসাধনা এ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। WBMDFC- Knowledge Series বিভাগের প্রথম পর্যায়ে চারজন মনীষী হাজি মহম্মদ মহসিন, ডঃ হাসান সোহরাওয়ার্দী, তিতুমির ও ভগিনী নিবেদিতার কর্মসাধনা অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

WBMDFC- Knowledge Series-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো কতিপয় মনীষী যেমন বেগম রোকেয়া, বেনীমাধব বড়ুয়া, স্যার আজিজুল হক এবং লালন শাহ-এর কর্মসাধনা অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা আশা রাখি বেগম রোকেয়া সম্পর্কে এই পুস্তিকাটি পড়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উপকৃত হবে।

মৃগাঙ্ক বিশ্বাস
ওএসডি এবং এক্স অফিসিও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

বেগম রোকেয়া

একটি জীবন, একটি ইতিহাস, এক বিপ্লব

প্রকাশ কাল
মিলন উৎসব
ফেব্রুয়ারি, ২০২২
ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
জুন, ২০২৩

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক দপ্তরের অধীনস্থ একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা)

বেগম রোকেয়া

একটি জীবন, একটি ইতিহাস, এক বিপ্লব

ভূমিকা

অবিভক্ত বাংলায় নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারী শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রনেত্রী, কলকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালিকা এবং উপমহাদেশে বেশ কিছু অমূল্য গ্রন্থের লেখিকা হচ্ছেন বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন। কল্যাণমুখী নারী জাগরণের সম্পর্কে কোনও কিছু লিখ তে হলে, স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে বাদ দিয়ে লিখলে তা হবে নিতান্তই অসম্পূর্ণ ও খন্ডিত আলোচনা। তাই বেগম রোকেয়ার জীবনীর শিরোনাম হতে পারে, 'একটি জীবন—একটি ইতিহাস'।

প্রকৃত অর্থেই বেগম রোকেয়া বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যে অসাধারণ কাজ করেছেন—তা যথার্থই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

সমাজের কল্যাণ কামনায় নিবেদিত প্রাণ এই মহিলার অবদানকে সংক্ষেপে অন্য কোন কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এখন যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বেগম রোকেয়া তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন, —নিজেকে এই কাজের পক্ষে যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়াস ও সংগ্রাম করেছিলেন—আমরা এক পলক সে দিকে তাকাবো।

সময় ও পটভূমি

বেগম রোকেয়ার জন্ম ১৮৮০ সালে। অনেকে বলেন, তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ওই বছরের ৯ ডিসেম্বর। আর পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৯৩২ সালের সেই ৯ ডিসেম্বর।

তাঁর জন্মসনের একশো বছরেরও কিছু বেশি সময় আগে ১৭৫৭ সালে ইংরেজরা বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করে। ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' এবং ১৮২৮ সালে 'লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত আইন' পাস করার ফলে বাংলার সমগ্র কৃষিজীবি সম্প্রদায় অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও এর প্রভাব ছিল সাংঘাতিক। বাংলায় মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল– অর্থ ও আনুকূল্যের অভাবে তা ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যায়। ১৮৩৭ সালে 'ফার্সি'র স্থানে ইংরেজিকে সরকারী ভাষা করার ফলে চাকুরী, আইন-আদালত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলমানদের সুযোগ সুবিধা সংকুচিত হয়ে যায়।

শৈশব, আত্মপ্রস্তুতি ও বিবাহ

বাংলার মুসলমানের এই ধরনের এক চরম অবক্ষয়ের যুগে অবিভক্ত বঙ্গের রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামের খানদানী জমিদার পরিবারে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে বেগম রোকেয়ার জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম জহিরউদ্দিন মুহম্মদ আবু আলি হায়দার সাবির। রোকেয়া লিখেছেন

‘‘সাড়ে তিনশত বিঘা লাখেরাজ জমির মাঝখানে আমাদের এই সুবৃহৎ বসতবাটী। আমাদের শৈশব জীবন পল্লীগ্রামের নিবিড় অরণ্যে পরম সুখে অতিবাহিত হইয়াছে।’’

আগেই বলেছি সেই সময়ে ইসলামের কল্যাণমুখী ও গতিশীল শিক্ষাকে ভুলে মুসলমানেরা আশ্রয় নিয়েছিল গোঁড়ামী আর কুসংস্কারের বদ্ধ দুর্গে। মুসলমান ছেলেদের জন্যই তখন শিক্ষার তেমন কোন পরিবেশ ছিলনা। মেয়েদের কথা তো ভাবাই যায় না।

বেগম রোকেয়ার আরো দুই ভাই এবং দুই বোন ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম আবুল আসাদ সাবের এবং খলিলুর রহমান সাবের সে যুগেই কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। কিন্তু মেয়েদের বিষয়ে রোকেয়ার পিতা ছিলেন অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী এবং নারী শিক্ষার ঘোরতর বিরোধী। মেয়েদের কেবল কোরআন শরীফ পড়ার জন্য খানিকটা আরবী শেখানো হতো।

রোকেয়ার পরিবারে অবরোধ প্রথার বাড়াবাড়ি ছিল এমন যে মেয়েদের বাড়ির ভিতরেও অপরিচিত ও অনাত্মীয়া মেয়েদের কাছেও পর্দা করতে হতো! অবশ্য খুব ছোট বেলায় রোকেয়ার পিতা স্নেহ পরবশ হয়ে কন্যাকে একটু বাংলা পড়িয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি তা বন্ধ করে দেন। তবে রোকেয়ার জ্ঞান পিপাসা ছিল অপরিসীম। তিনি গভীর রাত্রে পিতা ঘুমিয়ে পড়লে বড় ভাই ইব্রাহিমের নিকট মোমবাতি জ্বেলে বই নিয়ে বসতেন। রোকেয়া লিখেছেন ‘জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসীম স্নেহ ও অনুগ্রহে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছি। অপর আত্মীয়-স্বজনেরা আমার শিক্ষায় উৎসাহ দান তো দূরে থাকুক, বরং নানা প্রকার বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেন। কিন্তু তথাপি আমি পশ্চাদপদ হই নাই। ভ্রাতাও কাহারও বিদ্রূপে ভগ্নোৎসাহ হইয়া আমাকে পড়াইতে ক্ষান্ত হন নাই।’’

ভাইয়ের সহযোগিতায় রোকেয়া জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হতে লাগলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী করিমুন্নেসার বিয়ে হল ময়মনসিংহের দেলদুয়ারের জমিদার পরিবারে। বিদ্যা শিক্ষা লাভের জন্য করিমুন্নেসারও ঐকান্তিক আগ্রহ এবং সেই সঙ্গে প্রতিভাও ছিল। রোকেয়া বোনের শ্বশুর বাড়ি কলকাতায় এসে যখন থাকতেন—তখনও বাংলা, উর্দু ও ফারসী শিক্ষার সুযোগ পেতেন। তাঁর বড় বোন তাঁকে ইংরাজী শেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। রোকেয়া তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন "আপাজান! আমি শৈশবে তোমারই স্নেহের প্রসাদে বর্ণপরিচয় পড়িতে শিখি। একমাত্র তুমিই আমার বাংলা পড়ার অনুকূলে ছিলে। আমাকে সাহিত্য চর্চায় তিনিই (করিমুন্নেসা) উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।"

স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন-এর সঙ্গে বেগম রোকেয়া

আনুমানিক ১৬ বৎসর বয়সে বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুরের সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে রোকেয়ার বিয়ে হয়। সাখাওয়াত তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তার আগে তিনি হুগলি কলেজ থেকে পাস করে কৃষি শিক্ষার বৃত্তি নিয়ে ইংলন্ডে গিয়েছিলেন এবং অনেকগুলো প্রাইজ ও মেডেল নিয়ে এসেছিলেন। সাখাওয়াতের প্রথমা স্ত্রী অল্প বয়সেই একটি মাত্র কন্যা রেখে পরলোকগমন করেন। বিবাহিত জীবনে স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের আনুকূল্য ও প্রেরণা তাঁর সঙ্গী হয়েছিল। মার্জিত ও উদার হৃদয়সম্পন্ন সাখাওয়াত হোসেনের উৎসাহে রোকেয়ার বিদ্যাচর্চা অব্যাহত থাকে এবং

তিনি ইংরাজী ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জণ করেন। স্ত্রীকে সাখাওয়াত স্বজাতির উন্নতি-বিধানের চেষ্টাতেও উৎসাহিত করেন।

এরই মধ্যে তাঁর সংসার জীবনে দুর্বিপাক দেখা দেয়। বেগম রোকেয়ার পর পর দুটি সন্তান মারা যায়। কিছুদিন পর সাখাওয়াত হোসেন তখনকার যুগে দুরারোগ্য বহুমূত্র রোগে (ডায়াবেটিস) আক্রান্ত হন। রোকেয়া লিখেছেন, ‘‘আমার মতো দুর্ভাগিনী অপদার্থ বোধ হয় এ দুনিয়ায় আর একটাও জন্মায়নি। শৈশবে বাপের আদর পাইনি। বিবাহিত জীবনে কেবল স্বামীর রোগের সেবা করেছি। প্রত্যহ Urine পরীক্ষা করেছি। পথ্য রেঁধেছি, ডাক্তারকে চিঠি লিখেছি, দুবার মা হয়েছিলুম—তাদেরও প্রাণ ভরে কোলে নিতে পারিনি। একজন ৫ মাসে, একজন ৪ মাস বয়সে চলে গেছে।” অবশেষে মাত্র ১৩ বৎসরের দাম্পত্য জীবনের পর ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মে সাখাওয়াত হোসেন পরলোক গমণ করেন। রোকেয়ার বয়স তখন ২৯।

সংগ্রাম ও কর্মজীবন

বিয়ের পর ভাগলপুর গিয়ে বিহারের মেয়েদের বাংলার তুলনায় আরও শোচনীয় অবস্থা দেখে রোকেয়া ব্যথিত হন। তিনি এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য নারী শিক্ষার প্রচলন, ইসলাম সম্মত নয় এমনি প্রচলিত অবরোধ প্রথার বিলোপ সাধন করে শালীনতাপূর্ণ ইসলামী হিযাব ব্যবস্থার প্রবর্তন করার কথা ভাবতে থাকেন। পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের সার্বিক কল্যাণের কথাও বেগম রোকেয়া বিশেষভাবে চিন্তা করছিলেন। তাঁর এই সমস্ত চিন্তা-ভাবনার কথা ‘নবনূর’, ‘নবপ্রভা’ ও ‘মোহাম্মদী’ প্রভৃতি তখনকার মুসলিম পত্রপত্রিকাতে নিবন্ধ ও গল্পাকারে এতদিন লিখে আসছিলেন। চেষ্টা করছিলেন অবক্ষয়ের শিকার সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করার। একজন চিন্তাশীল, প্রতিভাময়ী ও শক্তিশালী লেখিকা হিসাবে তিনি নিজেকে ইতিমধ্যেই

সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বেগম রোকেয়া অনুধাবন করেছিলেন, মেয়েদের শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। আর নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারীশিক্ষা একান্তভাবে প্রয়োজন।

সাখাওয়াত হোসেন মৃত্যুর আগে— বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন একটি মেয়ে স্কুল স্থাপনের জন্য স্ত্রীর নামে দশ হাজার টাকা রেখে গিয়েছিলেন। বেগম রোকেয়া স্বামীর মৃত্যুতে কঠিন আঘাত পেলেও ভেঙ্গে পড়লেন না। হৃদয়ে বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর তিনি মাত্র পাঁচটি মেয়ে নিয়ে ভাগলপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের শুরু করলেন। স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখার জন্য এর নামকরণ করলেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়'। কিন্তু তাঁর স্বামীর আত্মীয়দের দুর্ব্যবহারে তিনি শ্বশুরবাড়ি ভাগলপুর থেকে ১৯১০ সালে কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হন। অদম্য মনোবলের অধিকারিনী বেগম রোকেয়া ১৯১১ সালের ১৬ই মার্চ কলকাতার ওয়ালীউল্লাহ লেনের গলিতে একটি ছোট্ট ঘরে আট জন মাত্র মেয়েকে নিয়ে পুনরায় স্কুল শুরু করলেন। প্রথমে তাঁর এই প্রচেষ্টাকে একটি অবাস্তব উদ্যোগ বলে সকলে ধরে নিয়েছিলেন। এর সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা তাঁর অতি বড় শুভানুধ্যায়ীরাও দেখতে পাচ্ছিলেন না। সমাজের অন্য কারো সাহায্য-সহযোগিতার সম্ভাবনা নেই, নিজের টাকাকড়িও অতি সামান্য।

১৩, ওয়ালিউল্লাহ লেন, কলকাতা-১৬। রোকেয়া ১৬ মার্চ ১৯১১ সালে এই ভবনে দু'কামরার ভড়াবাড়িতে তাঁর স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

এ অবস্থায় হিযাব পরিহিতা ত্রিশ বৎসর বয়স্কা এক মুসলিম বিধবা যিনি শিক্ষাদান, মেয়ে স্কুলের সংগঠন ও পরিচালনা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা—তিনি মুসলিম ঘরের মেয়েদের শিক্ষিত করার ব্রত গ্রহণ করলেন অথচ তাদের অভিভাবকরা এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র উৎসাহী বা আগ্রহী নন! বরং তিনি অবক্ষয় পীড়িত মুসলিম সমাজের বিভিন্ন মহল থেকে প্রবল বাধা ও নিন্দাবাদের সম্মুখীন হলেন। গোঁড়ামিপূর্ণ মানসিকতার কাগজগুলো সমস্বরে চিৎকার করতে আরম্ভ করলো, বেগম রোকেয়া ইংরেজিসহ অনান্য বিষয় শিক্ষা দিয়ে মুসলিম মেয়েদের ফিরিঙ্গি ও বদচলন বানাতে চান। কিন্তু রোকেয়া ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। তিনি এত টুকুও নত হলেন না। রোকেয়া কলকাতার প্রভাবশালী মুসলমানদের সঙ্গে বারবার দেখা করে তাদের ইসলামী সমাজের জন্য নারীশিক্ষার গুরুত্ব এবং এজন্য একটি আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। এভাবে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা বেশ কয়েক বৎসরের লাগাতার চেষ্টায় তিনি কিছু লোকের সমর্থন-সহযোগিতা আদায়ে সমর্থ হলেন।

এর মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা দ্রুত বর্দ্ধিত হওয়ায় স্কুল প্রতিষ্ঠার তৃতীয় বৎসরে স্থান সংকুলানের জন্য স্কুলটিকে ১৬২ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে (পুরাতন ৮৬/এ) একটি বড় বাড়িতে উঠিয়ে আনতে হয়। স্কুলের উন্নতির জন্য বেগম রোকেয়া তাঁর মন-প্রাণ, অর্থ-সম্পদ সব কিছু উজাড়

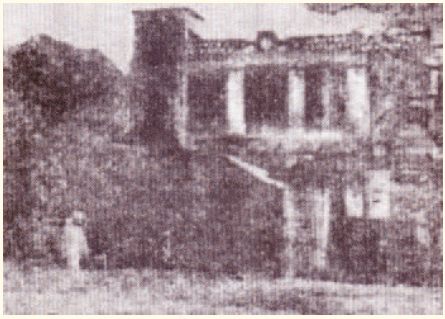

১৬২, লোয়ার সার্কুলার রোড়, কলকাতা-১৩। জুন, ১৯৩২ সালে রোকেয়ার স্কুলটি এই বাড়িতে তাঁর জীবদ্দশায় স্থানান্তরিত হয় এবং ৯ জিসেম্বর (শুক্রবার) ১৯৩২-এর প্রত্যূষে এই স্কুল-ভবনেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

করে ঢেলে দিলেন। স্কুল পলিচালনা কার্যে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তিনি কলকাতায় অন্য সম্প্রদায়ের বিখ্যাত বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে গিয়ে তাদের কার্যপ্রণালী নিরীক্ষণ করতেন এবং সেখানকার প্রধান শিক্ষিকাদের সঙ্গে স্কুল পরিচালনা, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ছাত্রীদের পাঠ্যবহির্ভূত কার্যক্রম নিয়ে মতামত বিনিময় করতেন। প্রয়োজনে নিজের স্কুলের জন্যও সেইসব উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। রোকেয়া স্কুল সম্পর্কে লিখেছেন ঃ ''বাহিরে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করিয়াছি। ভিতরে যে ছাত্রীদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা নয়—সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীদিগকেও ক্রমাগত নিজের হাতে গড়িয়া লইতে হইয়াছে।'' এ সময় স্কুলের টাকাকড়ি যে ব্যাঙ্কে জমা ছিল সেটি দেউলিয়া হয়ে যায়। গচ্ছিত অর্থকড়ি বিনষ্ট হয়।

সর্বস্বান্ত হয়েও রোকেয়া কিন্তু হতোদ্যম হননি। তিনি লিখেছেন ''আঠারো বৎসর ধরিয়া এই গরীব স্কুলকে অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য কেবল সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। দেশের বড় বড় লোক—যাহাদের নাম উচ্চারণ করিলেও রসনা গৌরব বোধ করে, তাঁহারাও প্রানপণে শত্রুতা সাধন করিয়াছেন। স্কুলের বিরুদ্ধে গতদিনে কত প্রকার ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তাহা একমাত্র আল্লাহই জানেন—আর কিছু কিছু এই দীনতমা সেবিকাও শুনিতে পায়। একমাত্র ধর্ম-ই আমাদিগকে বরাবর রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ...মজার কথা এই যে, স্কুলের জন্য আমি পার্থিব যে কোন জিনিসের প্রতি নির্ভর করিয়াছি, আল্লাহ আমাকে তাহা হইতেই বঞ্চিত করিয়াছেন। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, আমার মাতা সঙ্গে না থাকিলে আমার কলিকাতায় থাকা হইবে না। কিন্তু বৎসর অতীত না হইতেই মাতার মৃত্যু হইল। পরে ভাবিয়াছিলাম টাকা না থাকিলে স্কুল চলিবে না। কিন্তু বিদ্যালয় খুলিবার আটমাস পরেই বার্মা ব্যাঙ্ক ফেল হইল। অতঃপর আরও নানা কারণে একুনে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা নষ্ট হইল। তাহার পরে ভাবিয়াছিলাম, কলিকাতার কতিপয় গণ্যমান্য

রইসের সাথে মিলিয়া মিশিয়া না থাকিলে বিদ্যালয়সহ কলিকাতায় টিঁকিয়া থাকিতে পারিব না। কিন্তু সেই গণ্যমান্য লোকেরাও বিমুখ হইয়া দাঁড়াইলেন। সবই গিয়াছে। কেবল বিধাতার কৃপায় স্কুল আছে। এখন স্কুলের প্রায় ঝাড়া আঠার-উনিশ হাজার টাকা আছে। 'আমরা তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি'—কুরআন শরীফের এই বচনটিই আমি জীবনের পরতে পরতে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলাম।"

প্রথমে অভিভাকদের ইচ্ছা অনুযায়ী সাখাওয়াত স্কুলের ছাত্রী বহনকারী গাড়িতে দরজা-জানালা সব একদম বন্ধ থাকতো। এতে গরমে অনেক ছাত্রী অসুস্থ এমনকি অজ্ঞানও হয়ে যেতে লাগলো। বেগম রোকেয়া তখন দরজা-জানালা খুলে দিয়ে তাতে পর্দা লাগানোর ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু বাস ছুটলে কখনো কখনো বাতাসে পর্দার কাপড় ফাঁক হয়ে যেতে। পর্দা সামান্য সরে যাবার অজুহাতেও তৎকালীন উর্দু কাগজগুলো তাঁর প্রচন্ড সমালোচনা করে যে তিনি 'মুসলমান মেয়েদের মেম বানানোর সংকল্প করেছেন'। রোকেয়া তাতেও দমেন নি। সেই থেকে স্বাধীনতার পর সরকার কর্তৃক স্কুলের মুসলিম পরিচালনা কেড়ে নেওয়া অবধি সাখাওয়াত স্কুলের গাড়ির জানালায় পর্দার ব্যবস্থা ছিল। সমাজের এই নিন্দা গ্লানির কথা প্রসঙ্গে রোকেয়া এক চিঠিতে লিখেছেনঃ "এই যে হাড় ভাঙা গাধার খাটুনী, ইহার বিনিময় কি জানিস? বিনিময় হইতেছে 'ভাঁড় লিপকে হাত কালা' (উনুন লেপন করে হাত কালো) অর্থাৎ উনুন লেপন করিলে উনুন তো পরিষ্কার হয়, কিন্তু যে লেপন করে তাহারই হাত কালিতে

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গভঃ গার্লস হাই স্কুল

কালো হইয়া যায়। আমার হাড়ভাঙা খাটুনীর পরিবর্তে সমাজ বিস্ফারিত নেত্রে আমার খুঁটিনাটি ভুল ভ্রান্তির ছিদ্র অন্বেষণেই বদ্ধপরিকর।”

বেগম রোকেয়া কু-সংস্কার, অবরোধ ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁর এই সংগ্রামে সবথেকে বেশী সাহায্য পেয়েছিলেন তৎকালিন মুসলিম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট থেকে। মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মওলবী আবদুল করিম, সৈয়দ হাসান ইমাম, ‘দি মুসলমান’ পত্রিকার সম্পাদক মওলবী মুজিবর রহমান, ‘মোহাম্মদী’ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁন—প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেণযোগ্য। মাওলানা মুহাম্মদ আলীর কন্যা সাখাওয়াত স্কুলেই পড়তেন। তিনি রোকেয়াকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁর মনে সাহস সঞ্চার করেছেন। তাদের চেষ্টা, সহযোগিতা ও নিজেদের পত্র-পত্রিকায় রোকেয়ার উদ্যোগের সপক্ষে প্রচারের ফলে ধীরে ধীরে ‘বাধার পাহাড়’ খানিকটা অপসারিত হতে থাকে। মূঢ় সমাজপতি ও ধর্ম-ব্যবসায়ীরা ক্রমশ চুপ করে যেতে বাধ্য হন।

ধীরে ধীরে এইসব পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ও অন্যভাবে মুসলমান জন সাধারণ রোকেয়ার ত্যাগ ও কুরবানি, একাগ্রতা, সাধনা ও মহান আদর্শের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হতে থাকে। ভোপালের শাসক বেগম সুলতান জাঁহা, স্যার আবদুর রহীম, নওয়াব শামসুল হুদা প্রমুখ অনেকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন। মুসলিম জনসাধারণ সহ অনেক অজ্ঞাতনামা মুসলিমও বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য অর্থসাহায্য করেছেন। একবার একটি নববিবাহিত দম্পতি তাদের বিবাহের যৌতুকের টাকাকড়ি এবং অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী স্বেচ্ছায় স্কুলের তহবিলে জমা দিয়েছিলেন।

দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডু প্রমুখ সুধীবৃন্দ বেগম রোকেয়ার কর্ম প্রচেষ্টার ভূয়সী স্বীকৃতি প্রদান করেন। বিভিন্ন সময়ে বড়লাট পত্নী লেডি চেমসফোর্ড ও লেডি কারমাইকেল প্রভৃতি বিখ্যাত প্রভাবশালী

মহিলারা সাখাওয়াত স্কুল পরিদর্শনে আসেন এবং 'হিযাব পালনকারী এই মুসলিম নারীর কৃতিত্বে যারপরনাই বিস্মিত হন। ১৯১৭ সালে বিদ্যালয়টি মধ্য ইংরাজী ও পরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এই সময় থেকে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল হাইস্কুল সরকারী আর্থিক অনুদান লাভ করতে আরম্ভ করে।

শিক্ষা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী

রোকেয়া শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ''মেয়েদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে আদর্শ গৃহিনী, আদর্শ জননী এবং আদর্শ নারী রূপে পরিচিতা হইতে পারে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, বালিকাদিগকে দেশ ও জাতির সেবা এবং পরোপকার ব্রতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাও আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যের অন্যতম।''

তিনি মনে করতেন, কোরআনের যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। এজন্য তিনি চেয়েছিলেন লোকে অর্থ বুঝে কোরআন পড়ুক এবং কোরআনের শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবায়িত করুক। তিনি আফশোস করেছেন ''মুসলমান যাহারা স্বীয় পয়গম্বরের নামে প্রাণ দানে প্রস্তুত হন, তাহারা পয়গাম্বরের সত্য আদেশ পালনে বিমুখ কেন? .....কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া আমাদের প্রিয় নবী 'ফরয' (অবশ্য পালনীয় কর্তব্য) বলিয়াছেন, তবু কেন তাহারা কন্যা শিক্ষায় উদাসীন?'' এ সম্বন্ধে তিনি আরও লিখেছেন—''মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কোরআন শিক্ষাদান করা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। কোরআন শিক্ষা অর্থ শুধু টিয়া পাখীর মত আরবী আবৃত্তি করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কোরআন অনুবাদ শিক্ষা দিতে হইবে। সম্ভবতঃ এজন্য গভর্মেন্ট বাধ্যতামূলক আইন পাশ না করিলে আমাদের সমাজ মেয়েদের কোরআন শিক্ষাও দিবে না! যদি

কেহ ডাক্তার ডাকিয়া ব্যবস্থা-পত্র (Prescription) লয়, কিন্তু তাহাতে লিখিত ঔষধ-পথ্য ব্যবহার না করিয়া সে যদি ব্যবস্থা-ব্যবস্থাপনাকে মাদুলীরূপে গলায় পরিয়া থাকে, আর দৈনিক তিনবার করিয়া তাহা পাঠ করে, তাহাতে কি সে উপকার পাইবে? আমরা পবিত্র কোরআন-শরীফের লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কোনও কার্য্য করি না, শুধু তাহা পাখীর মত পাঠ করি, আর কাপড়ের (জুযদানে) পুরিয়া অতি যত্নে উচ্চ স্থানে রাখি। কিছুদিন হইল মিশর হইতে আগতা বিদুষী মহিলা মিস্ যাকিয়া সুলেমান এলাহাবাদে এক বিরাট মুসলিম সভায় বক্তৃতা দান কালে বলিয়া ছিলেন, 'উপস্থিত যে যে ভদ্রলোক কোরআনের অর্থ বোঝেন, তাঁহারা হাত তুলুন', তাহাতে মাত্র তিনজন ভদ্রলোক হাত তুলিয়াছেন। কোরআন জ্ঞানে যখন পুরুষদের এইরূপ দৈন্য, তখন আমাদের দৈন্য যে কত ভীষণ, তাহা না বলাই ভাল। সুতরাং কোরানের বিধি ব্যবস্থা কিছুই আমরা অবগত নহি।... আমার অমুসলমান ভগিনীগণ! আপনারা কেহ মনে করিবেন না যে, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোরআন শিক্ষা দিতে বলিয়া আমি গোঁড়ামীর পরিচয় দিলাম। তাহা নহে, আমি গোঁড়ামী হইতে বহুদূরে। প্রকৃত কথা এই যে প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থাই কোরআনে পাওয়া যায়। আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য কোরআন শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।"

নারী-জাগরণ

বেগম রোকেয়া নারীকে অবরোধ প্রথা হতে মুক্ত করতে এবং নারী জাগৃতির উন্মেষ ঘটাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু নারী-স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার তিনি ঘোরতর-বিরোধী ছিলেন। রোকেয়া রচনাবলীর সম্পাদক আবদুল কাদির লিখেছেন "বেগম রোকেয়া অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ চেয়েছিলেন, কিন্তু নারী পর্দা অর্থাৎ সুরুচি ও

শালীনতা বিসর্জন দেবে এটা তিনি কোনদিনই কাম্য মনে করেন নি। তার 'উন্নতির পথে' শীর্ষক রচনায় তিনি স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন, অতি আধুনিক রীতির বেলেল্লাপনা তাঁর কাছে কিরূপ শ্লেষের বিষয় ছিল।... তিনি 'বোরকা' শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলাম সম্মত পর্দা প্রথার অনুকূলে কথা বলেছেন। তিনি বিলাস-ব্যসন পরিহার বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করেন। তিনি লিখেছেন 'অলঙ্কারের টাকা দিয়ে জেনানা স্কুলের আয়োজন করা হোক'।" বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ বেগম রোকেয়ার বরাত দিয়ে লিখেছেন। 'ইসলাম নারীদের যে অধিকার দিয়াছে আমরা তাহার একবিন্দু কমেও আপস করিতে রাজী নহি।'

রোকেয়া শুধু স্কুলের কাজের মধ্যেই নিজের প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। মুসলমান নারীর সামগ্রিক কল্যাণের জন্য তিনি বিভিন্ন উপায়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'আনজুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' বা ইসলামী মহিলা সংস্থা নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমান মেয়েদের নানাভাবে জাগিয়ে তোলার আকাঙ্খা নিয়ে এবং তাদের সমাজসেবা ও পরোপকারে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে এ প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হয়। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় যে আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলন হয় তাতে বেগম রোকেয়া বাংলার মুসলিম মহিলাদের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন এবং প্রশংসনীয় কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন।

সাহিত্যিক রোকেয়া

বেগম রোকেয়ার সাহিত্য কীর্তি নিয়ে কোনও বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ এই ছোটো পুস্তিকায় নেই। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর সম্পর্কে বলেন "এ যুগের (ত্রিশের দশক পর্যন্ত) মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ গৌরবের আসন এই তিন

জনের—মিসেস রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, কাজী ইমদাদুল হক ও লুৎফর রহমান।” ‘সওগাত’ পত্রিকার মন্তব্য “বঙ্গীয় মুসলমান মহিলাগণের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রধান লেখিকা।” হিন্দু মুসলমান মিলিয়েও সে যুগের লেখিকাদের মধ্যে অনেকে তাকে অগ্রগণ্য বিবেচনা করেছেন।

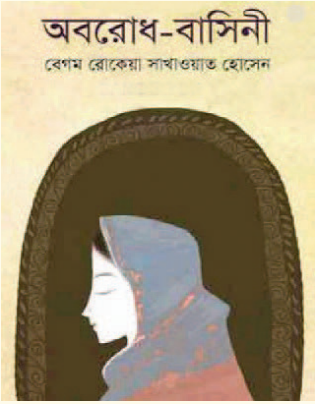

বেগম রোকেয়া লিখিত পুস্তক

বেগম রোকেয়া প্রবন্ধ, ছোট গল্প, উপন্যাস, ব্যঙ্গ রচনা এবং কবিতা প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগেই অবাধে বিচরণ করেছেন। ‘মতিচুর’, ‘পদ্মরাগ’, ‘অবরোধ বাসিনী’, ‘Sultana’s Dream’ প্রভৃতি গ্রন্থ, এবং পত্র-পত্রিকায় (গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত) ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য গল্প ও প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন। ঢাকার বাংলা একাডেমী বেগম রোকেয়া রচনাবলীতে সেগুলো সংকলন করেছে। {কলকাতার বিশ্বকোষ পরিষদও এপার বাংলায় বেগম রোকেয়ার একটি রচনাবলী প্রকাশ করেছেন}। বেগম রোকেয়া অ্যানি বেসান্ত ইসলাম ও মুহাম্মদ সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা বাংলায় তরজমা করে ‘নূর ইসলাম’ নামে প্রকাশ করেছিলেন।

মৃত্যু

১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বরের উষাকাল। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে স্কুলের কাজ করে বেগম রোকেয়া শুয়েছিলেন। কিন্তু সূর্য ওঠার আগেই ফজরের নামায পড়ার অভিপ্রায়ে সেই শীতের রাতে তিনি ওজু করতে গেলেন। এমন সময় হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে বেগম রোকেয়া মৃত্যুবরণ করেন। বেগম রোকেয়া এক বক্তব্য প্রসঙ্গে

বলেছিলেন ‘‘একমাত্র আল্লাহ-ই আমার ভরসা। প্রতিদিন ভোরে আমি পাক কোরআনের ২/৩ পৃষ্ঠা পড়লে কত শান্তি পাই। কত সান্ত্বনা রয়েছে দ্বীন-দুনিয়ার মালেকের কাছে।’’

কলকাতার বুআলি হোস্টেলের মসজিদ প্রাঙ্গণে বেগম রোকেয়ার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় সোদপুরে। সেখানে তাঁর আত্মীয় মওলবী আবদুর রহমান খাঁ সাহেবের বাগান বাড়িতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। যদিও এবিষয়ে অনেক প্রশ্ন থেকে গেছে। এই মহীয়সী নারীর মৃত্যু সংবাদে সমস্ত দেশে শোকের ছায়া নেমে আসে। কলকাতার বেশ কিছু পত্রপত্রিকায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়।

বু-আলি মসজিদ, ১, কাইজার স্ট্রিট, কল-১২। ৯ডিসেম্বর, ১৯৩২-এর দুপুরে এই মসজিদ প্রাঙ্গণে রোকেয়ার নামায়-এ জানাযা পাঠ করা হয়।

বেগম রোকেয়া ও আমরা

তাঁর কৃতিত্ব ও সাফল্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে প্রথমেই যে কথাটি বলতে হয় তা হলো, তাঁর এই চলার পথে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ এক নিঃসঙ্গ রমণী। 'হিন্দু নারী শিক্ষা বিস্তার ও নারী জাগরণের প্রাথমিক উদ্যোগের সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের সবাই ছিলেন পুরুষ। আর এক্ষেত্রে কেউই একক কৃতিত্বের দাবীদার নন। 'স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক পুস্তক' প্রকাশ করা থেকে শুরু করে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত দীর্ঘ যাত্রাপথে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুণ অনেকের নামই স্মরণ করতে হয়। সঙ্গে ছিল 'হিতৈষী ইংরেজ রাজপুরুষদের সহযোগিতা'।

কিন্তু মুসলিম নারীদের শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টায় রোকেয়া বলতে গেলে ছিলেন সম্পূর্ণ একাকিনী। তাঁর ভূমিকা ছিল ফৌজবিহীন সেনাপতির, যে একাই যুদ্ধ করে চলেছে। একজন নারীর পক্ষে তা সে যুগে যে কত বড় চ্যালেঞ্জ ছিল—তা আমরা খানিকটা আন্দাজ করতে পারি।

যাইহোক পরবর্তীকালে বাংলা দেশে (পূর্ব পাকিস্তান) যারা নারী জাগরণে উল্লেণযোগ্য ভূমিকা পালন করেন তারা অনেকেই ছিলেন বেগম রোকেয়ার স্কুলের ছাত্রী।

রোকেয়ার জীবনব্যাপী স্বপ্ন ও সাধনার মূর্ত্তরূপ হলো এই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়। এই স্কুলটির একটি উর্দু বিভাগও রয়েছে। ফলে প্রতি বছর এই প্রতিষ্ঠানে ৪০-৫০ জন উর্দুভাষী মেয়ে শিক্ষার সুযোগ পান।

মুসলিম নারী শিক্ষার ব্যবস্থা, প্রসার ও অগ্রগতির জন্য বেগম রোকেয়া তাঁর মৃত স্বামীর নামে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন,

বর্তমানে তা লর্ড সিনহা রোডে একটি নামজাদা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল হিসাবে শিক্ষা জগতে স্থান করে নিয়েছে।

২০০৪ সালে বিবিসি 'সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি'-কে বা কারা সেজন্য যে ভোটগ্রহণ করেছিল, তাতে বেগম রোকেয়াকে ষষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে।

সে সময় ইউরোপে নারীদের কী অবস্থা সে সম্পর্কে বেগম রোকেয়া অবগত ছিলেন। বেশ কয়েকজন মহিলা লেখিকার বক্তব্য ও চিন্তাধারা সম্পর্কেও রোকেয়া জানতেন। কলকাতাতে যে সকল অগ্রগণ্য বিদুষী হিন্দু মহিলা কাজ করছিলেন, তাদের সঙ্গেও বেগম রোকেয়া যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন শুধু বাংলা বা ভারত নয়, ইউরোপেও মেয়েদের অবস্থা ভালো নয়। ইউরোপ আমেরিকার বহু দেশে মেয়েদের ভোটাধিকার বা সম্পত্তির অধিকারও ছিল না।

অনেকে বেগম রোকেয়াকে 'নারীবাদী' মহিলা হিসাবে বর্ণনা করতে পছন্দ করেন। কিন্তু ইউরোপে বা আধুনিক ভারতে অনেকে যেভাবে নারীবাদকে চিত্রিত করেন বেগম রোকেয়া কিন্তু তার অনুবর্তী ছিলেন না।

বেগম রোকেয়া নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্বন্নয়ে এবং সদর্থক ভূমিকায় সমাজের অগ্রগতিতে বিশ্বাস করতেন। তিনি তাঁর নিবন্ধ 'সুগৃহিণী'-তে লিখেছেন, 'নারী ও নর উভয়ে একই বস্তুর অঙ্গ বিশেষ। ...তাই একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না'। 'সমাজের অর্ধঅঙ্গ বিকল রাখিয়া উন্নতি লাভ করা অসম্ভব।' বেগম রোকেয়া সে যুগেই নাগরিক অধিকারের দাবি তুলেছিলেন। লিখেছিলেন 'সায়েন্স ফিকশন'।

আজ সময় এসেছে বেগম রোকেয়ার চিন্তাধারাকে বাংলার অখণ্ড সমাজের কাছে তুলে ধরার। তবে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য এপার বাংলায় বাঙালি মুসলমানদের জন্য। তাদের সবার সঙ্গে সামনের সারিতে স্থান করে নেওয়ার জন্য তারা যে প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন, মহিয়সী রোকেয়ার চিন্তা ও চেতনার আলো তাতে অনেকটাই পথ প্রদর্শনের কাজ করতে পারে।

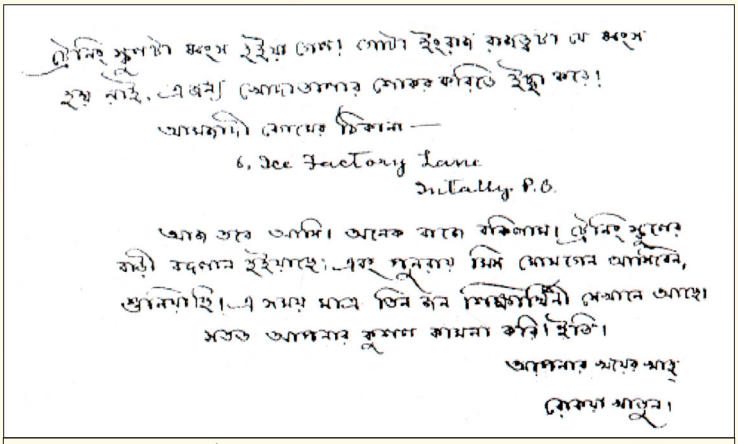
ট্রেনিং স্কুলটী মহৎ হইয়া গেল। লোটা ইংরাজ কর্মচারী যে মহৎ হয় নাই, এজন্য মোসলেমের শোকর করিতে ইচ্ছা করে।

আমেরিকা বেগমের ঠিকানা —

6, Ice Factory Lane
Mitchelly P.O.

আজ তবে আসি। অনেক কাজে বকিলাম। ট্রেনিং স্কুলের কর্তা বদলান হইয়াছে। এবং পুনরায় মিস মোসলেম আসিবেন, শুনিতেছি। এ সময় মাত্র তিন জন শিক্ষার্থিনী সেখানে আছে। সতত আপনার কুশল কামনা করি। ইতি।

আপনার স্নেহের আর

রোকেয়া খাতুন।

রোকেয়ার একটি চিঠির প্রতিলিপি ঃ সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা ও লেখিকা ফতেমা খানমকে লিখিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আহমদ হাসান

Helpline

1800 120 2130

Visit Us at

http://www.wbmdfc.org/

WEST BENGAL MINORITIES' DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION

(A Statutory Corporation of Govt. of West Bengal)

"AMBER" DD-27/E, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-700064